সাধনা

জীবনের উপলব্ধি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথম বাংলা অনুবাদে প্রকাশিত

সূচিপত্র

ব্যক্তির সঙ্গে বিশ্বের সম্বন্ধ ১১

আত্মচেতনা ৩০

অশুভের সমস্যা ৪৯

ব্যক্তিসত্তার সমস্যা ৬৭

প্রেমে উপলব্ধি ৮৮

কর্মে উপলব্ধি ১০৯

সৌন্দর্যের উপলব্ধি ১২৪

অসীমের উপলব্ধি ১৩২

ব্যক্তির সঙ্গে বিশ্বের সম্বন্ধ

প্রাচীন গ্রীসের সভ্যতা শহরের প্রাচীর বেষ্টনীর মধ্যে প্রতিপালিত হয়েছিল। বস্তুত, সমস্ত আধুনিক সভ্যতারই শৈশবভূমি ছিল ইঁট ও চুনবালির তৈরী।

এই প্রাচীরগুলি মানুষের মনে গভীর রেখাপাত ক'রে যায়। আমাদের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এরা "বিভেদ ও শাসনের" এক নীতি প্রণয়ন করে, এই নীতি যা কিছু আমরা জয় করি সেই সমস্তই দুর্গের মধ্যে সংরক্ষিত করার আর একের থেকে অন্যকে বিচ্ছিন্ন করার একটি অভ্যাস আমাদের মধ্যে জন্মিয়ে দেয়। আমরা দেশ ও দেশকে, জ্ঞান ও জ্ঞানকে, মানুষ ও প্রকৃতিকে বিভক্ত করি। এই বিভাজন আমাদের তৈরী প্রাচীরের বাইরে যা কিছু রয়েছে, সব কিছুতে এক গভীর সন্দেহের সৃষ্টি করে আর তখন আমাদের পরিচিতির মধ্যে প্রবেশ করার জন্য সমস্ত কিছুকে কঠিন সংগ্রাম করতে হয়।

আর্য আক্রমণকারীদের দল প্রথম যখন ভারতবর্ষে দেখা দিয়েছিল তখন তা ছিল এক বিশাল বনভূমি, আর নবাগতরা দ্রুত তার সুযোগ নিয়েছিল। সেইসব বনভূমি সূর্যের প্রখর তাপ ও গ্রীষ্মমণ্ডলের বিধ্বংসী ঝড় ঝঞ্ঝায় তাদের নিরাপদ আশ্রয় দিয়েছিল, পশুচারণযোগ্য ভূমি দিয়েছিল, দিয়েছিল যজ্ঞের জ্বালানী কাঠ ও কুটির নির্মাণের সরঞ্জাম। যেখানে প্রাকৃতিক সুরক্ষার ও অপর্যাপ্ত খাদ্য ও পানীয়ের বিশেষ সুবিধা ছিল সেইসব নানা বনাঞ্চলে

আর্যদের বিভিন্ন গোষ্ঠী, তাদের পিতৃতান্ত্রিক গোষ্ঠীপ্রধানদের নিয়ে বসতি স্থাপন করেছিল।

এইভাবে ভারতবর্ষে অরণ্যের মধ্যে আমাদের সভ্যতার জন্ম হয়েছিল, আর এই রকমের সূচনা ও পরিবেশ থেকে সে এক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লাভ করেছিল। প্রকৃতির বিস্তৃত জীবন তাকে ঘিরেছিল, তাকে আহার ও বস্ত্র দিয়েছিল, আর তখন প্রকৃতির বিভিন্ন রূপের সঙ্গে তার অবিরত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয়েছিল।

মনে হতে পারে, এইরকম এক জীবন, মানুষের জীবনযাত্রার মান নীচু ক'রে তার বুদ্ধিকে নিষ্প্রভ ক'রে দেয় আর তার অগ্রগতির উৎসাহকে খর্ব করার দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু প্রাচীন ভারতবর্ষে আমরা দেখি যে অরণ্য-জীবনের পরিবেশ মানুষের মনকে অভিভূত করেনি, আর তার কর্মশক্তির প্রবাহকে ক্ষীণ করেনি, বরং তাকে এক বিশেষ গতিপথের নির্দেশ দিয়েছে। প্রকৃতির প্রাণবন্ত অগ্রগতির সঙ্গে সবসময় সংযুক্ত থাকায়, মানুষের মন তখন নিজের অধিকৃত সম্পদের চারিদিকে সীমানার প্রাচীর তুলে নিজের রাজত্ব বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত থেকেছে। অধিকার করা নয়, তার লক্ষ্য ছিল উপলব্ধি করা, তার চেতনাকে উন্নত ক'রে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে ও পারিপার্শ্বিকের মধ্যে থেকে প্রসারিত করা। সে অনুভব করেছিল সত্য সর্বব্যাপী, জীবনে এমন কিছু নেই যা জগতে সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র, আর সত্যকে লাভ করার একমাত্র উপায় সমস্ত কিছুর অভ্যন্তরে প্রবেশ ক'রে নিজের সত্তাকে পরিব্যাপ্ত করা। মানবাত্মা ও বিশ্বাত্মার মধ্যে এই মহান সমন্বয় উপলব্ধি করা ছিল প্রাচীন ভারতের অরণ্যবাসী ঋষিদের প্রচেষ্টা।

পরবর্তীকালে এমন এক সময় এসেছিল যখন আদিযুগের এই অরণ্যগুলি কৃষি জমির কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল আর চারিদিকে ঐশ্বর্যপূর্ণ নগরীর দ্রুত উত্থান হয়েছিল। ক্ষমতাশালী রাজ্য সকল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, বিশ্বের

সমস্ত বৃহৎ শক্তির সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ছিল। কিন্তু জাগতিক সমৃদ্ধির পূর্ণ বিকাশের সময়েও ভারতবর্ষের হৃদয় সবসময় অতীতে আত্মোপলব্ধির কষ্টসাধ্য আদর্শের দিকে ও তপোবনের মর্যাদাপূর্ণ সহজ সরল জীবনের দিকে সসম্ভ্রমে ফিরে দেখতো আর সেখানকার সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার থেকে সর্বোৎকৃষ্ট অনুপ্রেরণা লাভ করতো।

প্রকৃতিকে পরাভূত করছে ভেবে পাশ্চাত্য দেশ গর্বিত বলে মনে হয়; আমরা যেন এক প্রতিকূল জগতে বাস করি যেখানে আমরা যা কিছু চাই সবই এক অনিচ্ছুক ও অপরিচিত ব্যবস্থা থেকে আমাদের জোর ক'রে আদায় করতে হয়। এই আবেগ শহর-প্রাচীর গড়ে তোলার প্রবণতা আর মানসিক শিক্ষার ফল। কারণ শহর-জীবনে স্বাভাবিক ভাবেই মানুষ তার অন্তর্দৃষ্টির একাগ্র আলো নিজের জীবন ও কর্মের দিকে পরিচালিত করে আর যে বিশ্বপ্রকৃতির বুকে সে শুয়ে আছে তার সঙ্গে নিজের এক কৃত্রিম বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে।

কিন্তু ভারতবর্ষে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল স্বতন্ত্র; মানুষের সঙ্গে সে জগৎকে এক মহান সত্যের অংশ বলে গণ্য করেছিল। ব্যক্তি ও বিশ্বে যে সমন্বয় রয়েছে, তার উপরে ভারতবর্ষ তার সমস্ত গুরুত্ব আরোপ করেছিল। সে অনুভব করেছিল যে আমাদের পারিপার্শ্বিক সব কিছুই যদি আমাদের কাছে বহির্ভব হতো তা হলে আমরা কোনো রকমেই তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারতাম না। প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষের অভিযোগ হলো তার জীবন ধারণের পক্ষে অপরিহার্য বেশীর ভাগ বস্তু তাকে নিজের চেষ্টায় অর্জন করতে হয়। তা ঠিক, কিন্তু তার প্রচেষ্টাগুলি বিফল হয় না; প্রতিদিনই সে সাফল্য লাভ করে আর এর থেকে বোঝা যায় যে তার ও প্রকৃতির যোগাযোগের মধ্যে যুক্তি আছে, কারণ যার সঙ্গে আমাদের সত্যই সম্বন্ধ আছে তাকে ছাড়া অন্য কোনো কিছুকে আমরা কখনো আমাদের নিজের ক'রে নিতে পারি না।

একটি পথকে আমরা দুই ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পারি। কেউ মনে করেন আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যের থেকে এ আমাদের বিচ্ছিন্ন করছে; সেক্ষেত্রে এর উপর দিয়ে যাওয়ার প্রতি পদক্ষেপকে আমরা এমনভাবে গণনা করি যেন বাধার সামনে জোর করে কিছু লাভ করেছি। অন্য জন একে আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার পথ রূপে দেখেন, আর সেইভাবে এ আমাদের লক্ষ্যের এক অংশ হয়ে যায়। তখনই আমাদের সাফল্য শুরু হয়ে যায়, এবং এর উপর দিয়ে যাওয়াতে এ নিজে আমাদের যা দেয় আমরা সেইটুকু মাত্র লাভ করতে পারি। এই শেষেরটি প্রকৃতি সম্বন্ধে ভারতবর্ষের দৃষ্টিভঙ্গি। ভারতবর্ষের কাছে পরম সত্য হলো প্রকৃতির সঙ্গে আমরা সমন্বিত; মানুষ চিন্তা করতে পারে কারণ তার চিন্তাগুলি সবকিছুর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ; প্রকৃতির শক্তিকে সে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারে তার একমাত্র কারণ তার নিজের শক্তি বিশ্বব্যাপী শক্তির সঙ্গে মিলিত, এবং কালের প্রবাহে প্রকৃতির মধ্যে দিয়ে যে উদ্দেশ্য সাধিত হয়ে চলেছে তার সঙ্গে তার নিজের উদ্দেশ্য কখনো কোনো সংঘাতে আসতে পারে না।

পাশ্চাত্যে একটি প্রচলিত অনুভূতি হলো প্রকৃতি শুধুমাত্র অচেতন বস্তু আর জীবজন্তুদের অধিকারভুক্ত, হঠাৎ অকারণে নিয়মভঙ্গ হওয়ায় সেখানে মানব-প্রকৃতির সূত্রপাত। এই অনুভব অনুযায়ী অস্তিত্বের তুলাদণ্ডে নীচুস্তরের সবকিছু প্রকৃতি মাত্র, আর যার উপরেই বৌদ্ধিক বা নৈতিক পূর্ণতার ছাপ রয়েছে, তা হলো মানব-প্রকৃতি। এ যেন কুঁড়ি ও ফুলকে দুইটি আলাদা শ্রেণীতে ভাগ করার মতো আর তাদের স্বাভাবিক মাধুর্যকে দুইটি ভিন্ন ও বিরুদ্ধ তাত্ত্বিক গুণ বলে স্বীকার করার মতো। ভারতীয় মানস কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে তার আত্মীয়তা, সকলের সঙ্গে তার অটুট সম্বন্ধ স্বীকারে কখনো কোনো দ্বিধা করেনি।

ভারতবর্ষের কাছে সৃষ্টির মূলগত ঐক্য শুধুমাত্র দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা

ছিল না; তার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল অনুভবে ও কর্মে এই মহান ঐক্য উপলব্ধি করা। সে তার চেতনাকে ধ্যানে ও কর্মে, এক নিয়মনিষ্ঠ জীবনের মধ্যে এমন ভাবে উন্নত করেছিল যে তার কাছে সমস্ত কিছুরই এক আধ্যাত্মিক অর্থ ছিল। মাটি, জল ও আলো, ফল ও ফুল তার কাছে শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়গোচর প্রাকৃতিক বস্তু ছিল না যে প্রয়োজনে ব্যবহার ক'রে তারপর দূরে সরিয়ে দেওয়া যায়। প্রতিটি সুর যেমন সামঞ্জস্যপূর্ণ ঐকতান বাদনের জন্য আবশ্যক তেমন পূর্ণতার আদর্শে পৌঁছানোর জন্য এরা তার কাছে আবশ্যক ছিল। ভারতবর্ষ তার স্বাভাবিক অনুভূতিতে বুঝেছিল যে আমাদের কাছে জগতের বাস্তব অবস্থার এক অপরিহার্য গভীর অর্থ আছে; এ বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণ সচেতন থাকতে হবে আর এই অবস্থার সঙ্গে এক সচেতন সম্বন্ধ স্থাপন করতে হবে, এই সম্বন্ধ শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা বা জাগতিক সুযোগ সুবিধার লোভে সঞ্চালিত নয়, বরং সহানুভূতিপূর্ণ মানসিকতায় আনন্দ ও শান্তির মধ্যে গভীরভাবে অনুভূত।

বৈজ্ঞানিক জানেন যা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপে দৃশ্যমান, এক দিক দিয়ে জগৎ শুধু সেইটুকু মাত্র নয়; তিনি জানেন যে মাটি ও জল আসলে এমন সব শক্তির লীলা, যারা মাটি ও জল রূপে আমাদের কাছে নিজেদের প্রকাশ করছে— কি ভাবে করছে, আমরা তা কেবল আংশিক ভাবে বুঝতে পারি। সেই রকম যাঁর আধ্যাত্মিক দৃষ্টি উন্মুক্ত, তিনি জানেন যে মাটি ও জলের পরম সত্য নিহিত রয়েছে শাশ্বত ইচ্ছা সম্বন্ধে আমাদের চেতনার মধ্যে। এই ইচ্ছা সঠিক সময়ে কাজ করে আর যে রূপে আমরা এই শক্তি উপলব্ধি করি সেই রূপ নেয়। বিজ্ঞান যেমন, এ সেইরকম জ্ঞানমাত্র নয়, বরং এ হলো আত্মার দ্বারা আত্মার প্রত্যক্ষ। এ আমাদের ক্ষমতার দিকে চালিত করে না, যেমন জ্ঞান করে, কিন্তু এই প্রত্যক্ষ আমাদের আনন্দ দেয়, এই আনন্দ উৎসারিত হয় সমস্ত

সজাতীয় বস্তুর সম্মেলনে। বিজ্ঞান যত গভীরে নিয়ে যায় তার থেকে গভীরে জগতের সঙ্গে যার পরিচয় নেই, সে কখনোই বুঝবে না যার আধ্যাত্মিক দৃষ্টি আছে সে এই জগৎ প্রপঞ্চে কি দেখতে পায়। জল শুধুমাত্র তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে ধৌত করে না, তার হৃদয়কেও পরিশুদ্ধ করে; কারণ সে তার আত্মাকে স্পর্শ করতে পারে। পৃথিবী তার দেহকেই শুধু ধারণ করে না, তার মনকেও আনন্দিত করে; কারণ দৈহিক সংযোগের থেকেও বেশী তার এই যোগ— এ তার প্রাণবন্ত প্রকাশ। মানুষ যখন জগতের সঙ্গে আত্মীয়তা উপলব্ধি করে না, তখন এমন এক বন্দিশালায় সে বাস করে যার দেওয়ালগুলি তার কাছে অপরিচিত। সমস্ত বস্তুর মধ্যে যখন সে শাশ্বত আত্মার সাক্ষাৎ পায়, তখন বন্ধন মুক্ত হয়, কারণ তখন যে জগতে সে জন্মগ্রহণ করেছে সেই জগতের সম্পূর্ণ তাৎপর্য সে আবিষ্কার করে; তখন সে নিজেকে পূর্ণ সত্যের মধ্যে দেখতে পায়, আর সকলের সঙ্গে তার ঐক্য স্থাপিত হয়। ভারতবর্ষের মানুষ তাদের দেহ ও আত্মা যে চারপাশের সমস্ত কিছুর সঙ্গে অতি অন্তরঙ্গ আত্মীয়তায় যুক্ত এই বিষয়ে পুরোপুরি সচেতন থাকতে শেখে, আর তাই তাদের সকালের সূর্যকে, প্রবহমান জলধারাকে, ফলপূর্ণ বসুন্ধরাকে সেই প্রাণবন্ত সত্যের প্রকাশরূপে প্রীতি সম্ভাষণ করতে হয়, কারণ এই সত্য তাদের সকলকে পরিবেষ্টন ক'রে রয়েছে। এই জন্য আমাদের প্রতিদিনের ধ্যানের মন্ত্র হলো গায়ত্রী, এই মন্ত্র সমস্ত বেদের সার রূপে বিবেচিত। এই মন্ত্রের সাহায্যে আমরা মানুষের চেতন সত্তার সঙ্গে জগতের অপরিহার্য ঐক্য উপলব্ধি করার চেষ্টা করি; এক শাশ্বত আত্মা যে ঐক্য ধরে রেখেছে আমরা সেই ঐক্যের উপলব্ধি করতে শিখি, এই আত্মার শক্তি পৃথিবী, আকাশ ও গ্রহ নক্ষত্র সৃষ্টি করে আর সেই সঙ্গে আমাদের মনকে চেতনার আলোয় উদ্ভাসিত করে, এই চেতনা বহির্বিশ্বের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে থাকে ও সঞ্চারিত হয়।